জীবনের গল্প

বই	**জীবনের গল্প**
লেখক	সানজিদা সিদ্দিকী কথা
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন টিম
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

জীবনের গল্প

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

জীবনের গল্প

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com
ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ১৫০, US $ 8, UK £ 5

JIBONER GOLPO
Writer : Sanjida Siddiqui Kotha

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, Under Ground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95222-8-7

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

জীবনের গল্প। গল্পের জীবন। নানা গল্প-ঘটনা মিলেই আমাদের জীবন। কিন্তু কোনো গল্প বা ঘটনা আমরা অনুভব করতে পারি; কোনোটা পারি না। অথচ সে গল্পটি ছিল আমাদের শেখার; শেখানোর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক সেটিই তুলে ধরেছেন। যা পড়ে আপনি অনুভব করবেন; এতো আমাদের জীবনেরই গল্প। কিন্তু পূর্বে তা অনুভব করতে পারিনি।

এ বই পড়ে যদি সেই অনুভূতিটুকু আপনাকে জাগিয়ে তোলে তাহলেই আমাদের স্বার্থকতা।

সুতরাং পড়ুন জীবনঘনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী গল্পের অপূর্ব সংকলন—'জীবনের গল্প'। আর অনুভব করুন জীবনের ফেলে আসা নানা স্মৃতি...

জীবনঘনিষ্ঠ হৃদয়গ্রাহী এ গল্পগুলো তুলে ধরেছেন লেখক ও গল্পকার সানজিদা সিদ্দিকী কথা। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে এটিই তার প্রথম বই নয়। আরও দুটি প্রকাশ হয়েছে।

সুতরাং তার অন্য বই দুটির মতো আশা করি এ বইটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয় হবে।

বইটি সুন্দর ও উপকারী করতে আমরা চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তারপরও কোনো ভুল বা অসুন্দর পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর মনোভাব নিয়ে

জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৯ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

লোভ	৯
নিদ্রান্ময়	১৫
হৃদয়জুড়ে স্রষ্টার প্রেম	২০
সালাতের কদর	২৬
রাসুলের প্রতি ভালোবাসা	৩১
পিতা-মাতার ছায়া	৩৭
সবর	৪৮
খোদাভীতি	৫৩
অদ্ভুত	৫৯
শালিস	৬২
একলা পাখি	৬৫
আখেরি লেবাস	৬৮
জমজম ও খেজুর	৭২
এক সমুদ্র কৃতজ্ঞতা	৭৫
আত্মার মদ	৭৭
ধুতরোফুল	৭৯
মনের পর্দা	৮৩
প্যান্ট নষ্ট	৮৫
রিংকুর বাংলা খাতা	৮৭
ছেঁড়া কাপড়	৯০
গুডনাইট প্রেয়ার	৯২
সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে	৯৫
স্বপ্নভঙ্গ	১০৩

লোভ

রহিমার মা সবুজ ঘাসের ছোবা দিয়ে জোরে জোরে পাতিলের পোড়া অংশটুকু ঘষে চকচকে করে তোলার চেষ্টা করছে। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই, এই যে বাসার ভেতরে সকাল থেকে এত পরিমাণ হট্টগোল শুরু হয়েছে, এর কোনো কিছুই তার কান দিয়ে ঢুকছে না। রহিমার মা ভাবছে, বড়লোকের কথা বেশিরভাগ সময় কানে না ঢোকানোই ভালো; এতে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তার এক খিলি পান কেনা দরকার। পান মুখে দিয়ে কাজ করলে আরাম বেশি পাওয়া যায়। খালাম্মাকে চা দেবে কি না চিন্তা করছে। একবার ভাবল, দরকার নাই; এখন চা নিয়ে গেলে খালাম্মার তিনশত তেপ্পান্ন রকমের কথা শুনতে হবে। পরে ভাবল, থাক; প্রতিদিন এই সময় চা খায়, বকাঝকা করলেও রহিমার বিয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। বকাঝকার সময় রহিমা কানে তালা দিয়ে ফেলতে পারে। এরপর নানান বিষয় নিয়ে সুখী সুখী কল্পনা করে; সুখ না আসলে না আসুক, কল্পনা করতে সমস্যা কি!

রহিমার মা এই বাসায় কাজ করে বারো বছর হবে। রহিমার বাবা গেইটের দারোয়ানের চাকরি করে। ছাদে সিদ্দিক সাহেবের বিশাল বাগানের দেখাশোনাও করে। রহিমার বাবা মানে শাহ জাহান মিয়ার এক চোখ কানা। এতে তার চলতে ফিরতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না; কিন্তু চোখ কানা বলে কেউ কাজ দিতে চাইত না, তাই বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করত। রহিমার মা বাসা-বাড়িতে বুয়ার কাজ করত। বারো বছর আগে হাইকোর্টের মোড়ে ভিক্ষা করার সময় হঠাৎ দেখল, এক লোক রাস্তার পাশে বসে বমি করছে। পানি নিয়ে দৌড়ে গেল। মাথায় পানি দিয়ে ভিক্ষার টাকা থেকে ৫০ টাকা মিলিয়ে স্যালাইন কিনে সিদ্দিক সাহেবের কাছে ফিরে আসল শাহ জাহান।

সিদ্দিক সাহেব সেদিন রাস্তার একচোখ কানা ফকিরের কাছে এমন আর্দ্র ভালোবাসা পেয়ে কীভাবে ঋণ শোধ করবে, কিছুতে বুঝতে পারছিলেন না। এরপরে, পরপর সাত

দিন হাইকোর্টের সেই জায়গাটাতে অফিস শেষে নিয়ম করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সপ্তম দিন, যখন হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলেন; হঠাৎ দেখলেন শাহ জাহান মিয়া এক টোকাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কী জানি বলছেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিচ্ছেন। সিদ্দিক সাহেব দৌড়ে গেলেন তার কাছে। সেদিনের কথা শাহ জাহান মিয়ার এখনো মনে আছে।

শাহ জাহান এখনো স্পষ্ট দেখতে পায়; সিদ্দিক সাহেব হন্তদন্ত হয়ে তাকে বলছেন,

- আমাকে চিনতে পেরেছ?

- অবশ্যই পেরেছি স্যার। আমার এক চোখ কানা হইলে কি হবে! আরেকচোখের পাওয়ার তিন চোখের সমান। স্যার, শরীরটা ভালোনি এখন?

- আল্লাহ ভালো রেখেছেন; আমি তোমাকে সেদিন ধন্যবাদটাও দিতে পারিনি, আমি লজ্জিত।

পকেট থেকে ছোট একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন উনি।

- তুমি নিলে খুশি হব।

- স্যার, আমি এইডা নিমু না; ওইদিন ভালা কিছু কইরা থাকলে, তার প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছে চাইয়া নিমু। ওই পাড়ে গিয়া আল্লাহরে কমু, ও আল্লাহ! দুনিয়াতে আমারে একটা চোখ কম দিছিলা, আমার কোনো দুঃখ নাই; কিন্তু এখন আমারে দুইটা চোখ দেওয়ন লাগব। কোনোদিন কারও ক্ষয়-ক্ষতি করি নাই, পারলে উপকার করছি। এর বিনিময়ে তো আল্লায়ে দেবেনই, কী কন? দুনিয়ায় মানুষ এক চোখ নাই দেইখা কাজে নেয় না, কানা বইলা গালি দেয়।

- তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমার বাড়িতে দারোয়ানের ঘরে থাকবে; এমনিতেও আমার দারোয়ান নেওয়ার দরকার ছিল, সামনের মাসে। তুমি আমার সঙ্গে এখুনি চলো।

- স্যার, আমার পরিবার আছে, সে পোয়াতি, তারে ছাড়া কেমনে যামু। আমার বউটা বড় ভালা স্যার। আমার মনটা সব সময় কান্দে। পোয়াতি অবস্থায় বউটা বাসা-বাড়িতে কাম করতাছে। আহা!

সেদিন সন্ধ্যায় শাহ জাহান তার পোয়াতি বউসমেত সিদ্দিক সাহেবের সিঁড়ির ঘরে উঠে আসলেন; সেই থেকে এখানেই আছেন।

রহিমার মা বিকেলে ছাদে কাপড় উঠাতে এসে দেখল, স্বামী গাছে লাল রঙের লম্বা পাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছে, আর একমনে কী জানি গুনগুন করছে।

- রহিমার বাপ, বাড়ির অবস্থা ভালা না।

- কী হইছে রে?

- খালাম্মার পাঁচ ভরির হার হারায়া গেছে গা; পুরা ঘর-বাড়ি ঘাইটা ফেলাইছে।

- কস কী।

- হ, রিন্টি মামনির বিয়া কয়দিন পর; এইজন্য লকার থিকা আজকেই বাড়িত আনছে। খালাম্মা আমার দিকে কেমনে তাকাইতাছে। রিন্টি মামনিরে বলতে শুনছি, তার মায়েরে কইতেছে আমার ঘর ঘাইটা ফালাইলেই পাওয়া যাইব। ও রহিমার বাপ, কী করমু আফনে কন?

- এইটা তো বিরাট সর্বনাশের কথা রে; আচ্ছা দেখি কী করন যায়, যা তুই নিচে; এইখানে সেরি করনের কাজ নাই।

- যাইতাছি, বিকালে খাইবেন কিন্তু; দুপুরের খিচুড়ি রইয়া গেছে, দিমু?

শাহ জাহান চিন্তিত ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

- নাহ, খামু না। রাইতে একবারে দিছ

।।

- খালাম্মা পুরি বানামু?

- এত কথা বলো না তো রহিমার মা, তোমার কি মনে হচ্ছে আমি সসে ডুবিয়ে পুরি খাওয়ার মতো আনন্দে আছি?

রহিমার মা চুপ করে রইল।

- ঘর-বাড়ি গুছিয়ে রাখো রহিমার মা, তোমার খালু থানায় গেছে পুলিশ নিয়ে আসতে।

- পুলিশের কাম কী? চুরে কী গয়না ঘরে রাইখা যাইব গা?

- বাড়তি কথা বলবে না রহিমার মা।

- ও খালাম্মা। ব্যাংক থেকে গয়না আইনা ব্যাগ থিকা বাইর করছিলেন বাসায় আইসা? রাস্তা-ঘাটে পইড়া রইছে নাকি কে জানে। ঘরে থাকলে তো পাওন যাইব; রাস্তায় পড়লে পাইবেন কেমনে?

রিনা রহিমার মা'র কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন, তার এমনিতেই মনভোলা রোগ, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না; হতেও তো পারে উনি ব্যাগেই ঢোকাননি, অথবা

চেইন লাগাননি, কোনো একসময় নিচে পড়ে গেছে। রিনা, পুরোপুরি বিভ্রান্ত বোধ করছেন।

রহিমার মা মুখভর্তি পান চিবুতে চিবুতে বলল, খালাম্মা তাইলে আমি এলা ঘরে যাইগা। কাজকাম গুছায় ফালাইছি সব। আবার সাতটার দিকে আসমুনে। দরকার লাগলে খবর দিয়েন।

পুলিশ আসল আরও আধাঘণ্টা পর। লাভের লাভ তেমন কিছু হয়নি। সাধারণ কথাবার্তা। পুলিশ কন্সটেবল উঠবার সময় শুধু রিন্টি এসে বলল:

- আংকেল, আমাদের বাসায় যিনি কাজ করে তার বাসা নিচেই। আমি বলছি না উনি কিছু করেছেন, তবু মনের শান্তির জন্য একটু ওদের বাসাটা দেখলে হতো না?

- বুয়া থাকে কোথায়?

-আমাদের নিচের সিঁড়িঘরেই। আমাদের দারোয়ান ভাইয়ের বউ।

- আচ্ছা আচ্ছা।

।।

রহিমার মা তার ছোট স্টিলের আলমারি, রান্নাঘরের ছোট বাক্স পেটরা, টেবিলের ড্রয়ার, চকির তলা নিজ উদ্যোগী হয়ে দেখাতে লাগল।

পুলিশ কন্সটেবল মানিক মোহন, কিছুটা অবাক হলেও কিছু বলল না।

রহিমার মা অনবরত কথা বলছে।

- স্যার আপনেগো লগে লেডি পুলিশ নাই? আমারে যদি চেক করতে চান, সেইটার জন্য কইলাম আর কী।

- কথা কম বলবেন, বেশি কথা পুলিশের সঙ্গে বলার চেষ্টা করবেন না; যন্তসব।

শাহ জাহান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

।।

শাহ জাহান মিয়ার কী জানি হয়েছে। গত তিন দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া কিছু করতে পারছে না। সিদ্দিক সাহেব নিজে এসে দেখে গেছেন আজকে।

- কি রে, তোর শরীরের কী হাল। খাচ্ছিস না নাকি কিছু। ডাক্তার লাগলে যা; গেইট তালা মেরে যা আজকে।

- ডাক্তার লাগব না স্যার; এমনেই ভালো হইয়া যামু।

- কিছু খাইতে ইচ্ছা করলে কিনে খেয়ে নিস।

সিদ্দিক সাহেব শাহ জাহানের হাতে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিলেন।

শাহ জাহান সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলল দেখে মনে হচ্ছে, যেন কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে।

॥

বুধবার রাতে শাহ জাহান তার ছোটঘরের জিনিসপত্র দুইটা চটের বস্তায় বেঁধে ফেলল। আসবাবপত্র সিদ্দিক সাহেবই দিয়েছিলেন; এর সবই রেখে যাবে শাহ জাহান।

স্ত্রী-কন্যাকে ভোর চারটার দিকে ঘর থেকে নিয়ে বের হয়ে গেল। রহিমার মা অনবরত কান্নাকাটি করছে, কিন্তু শব্দ করার সাহস পাচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। চোখে আকুতি।

ছয়টার ট্রেন। এদের কমলাপুর রেখে আবার আসতে হবে। এরপর আবার কমলাপুর ফেরত গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। পাঁচটার দিকে সিদ্দিক সাহেব নামাজ পড়তে বেরোবে, ফজরের নামাজ।

॥

সিদ্দিক সাহেব ঘুম ঘুম চোখে মেইন গেইটের দিকে এগোচ্ছেন। শাহ জাহান গেইটের বাইরে দাঁড়ানো। সিদ্দিক সাহেব বুঝতে পারছেন না শাহ জাহান গেইটের বাইরে কী করছে। গেইট থেকে বেরোতেই শাহ জাহান সিদ্দিক সাহেবের হাত ধরে ফেলল। চোখভর্তি পানি। এক চোখে না দেখতে পেলেও দুই চোখ বেয়েই পানি পড়ছে ওর।

- স্যার গো, আমি কিছু কথা কমু; একটু শুনেন স্যার।

- এরকম করছিস কেন শাহ জাহান। ব্যাপারটা কী?

- স্যার, কত বছর আগে আপনারে আমি একপাতা স্যালাইন খাওয়াইছিলাম; এর বদলে আপনে আমার জীবনটা বদলাই ফালাইছেন। এতকিছু করছেন আমার জন্য, আমার মতো কানা ফকিন্নি মানুষ কুনোদিন ভাবেও নাই; আপনের ঋণ কুনোদিন আমি শোধ করতে পারমু না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কেমনে করি।

- এসব কথা কেন আসছে?

শাহ জাহান পকেট থেকে কাপড়ে মোড়ানো হারানো গয়না সিদ্দিক সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন,

- স্যার, আমার বউরে আপনে মাফ কইরা দিয়েন, খালাম্মারে বইলেন মাফ কইরা দিতে। আপনের সামনে আসার মুখ আমার নাই। রহিমার মা মেয়েছেলে মানুষ। লোভের কারণে খারাপ কাজটা কইরা ফেলাইছে। বউ কেমনে ফালায় দেই স্যার। আমি একদিন পরেই বুঝছিলাম; খালি কথা বের করতে পারতাছিলাম না। স্যার গো, মাফ কইরা দিয়েন স্যার।

সিদ্দিক সাহেব, হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন; এমন অশিক্ষিত একটা অন্ধ মানুষের এমন সততা উনাকে হতভম্ব করে দিয়েছে, উনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন; রিনাকে কিছু বলবেন না, এই গয়না রহিমাকে দেবেন উনি। নামাজ থেকে ফিরেই দিয়ে দেবেন।

- শাহ জাহান ঘরে যা। নামাজ পড়ে কথা বলব; যা ভেতরে।

শাহ জাহান মাথা নিচু করে রইল, কিছু বলল না।

সিদ্দিক সাহেব মসজিদের দিকে এগিয়ে চলল। শাহ জাহান তাকিয়ে রইল মিলিয়ে না যাওয়া অবধি।

শাহ জাহান চলে গেছে, আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। সিদ্দিক সাহেব ঠিক বারো বছর আগের মতো আবার শাহ জাহানকে খুঁজে বেড়ান। তার বিশ্বাস একদিন তিনি ঠিকই শাহজাহানকে পেয়ে যাবেন।

নিদ্রান্ময়

তন্ময় বিশাল একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে; নামছে তো নামছেই। কোনো থামাথামি নেই। কোথায় যাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। সিঁড়িপথটার কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছোট একটা আলোর বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে। তন্ময় দরদর করে ঘামছে। অসম্ভব রকমের আতঙ্ক লাগছে ওর।

মনে হচ্ছে, আর জীবনেও তিস্টেম্পার করা সাদা ধবধবে দেয়ালের ঘরে স্ত্রী তনুর টানটান করে বিছানো সাদা চাদরে ধপ করে শুয়ে পরতে পারবে না। সন্ধ্যা নামলে পাশের ঘর থেকে ওর মা সায়রা আক্তারের ইচ্ছা মতো পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ আর আদাকুচি দিয়ে ডলে মুড়ি মাখার পর—'ও তন্ময়, আয় মুড়ি মাখাইছি' এই ডাক শুনতে পাবে না। তিন মাস আগে ডিভোর্স হওয়া তার বড় বোন তাহিতির রুমের পাশে যাবার সময় চাপা কান্না শুনতে পাবে না। আর এরচেয়েও বড় কথা, তার একমাত্র মেয়ে তিতিরের পাপা ডাক আর শুনতে পাবে না; যদিও এই সমস্ত ব্যাপার তন্ময় খুব একটা পাত্তা দেয় না, তবে এই মুহূর্তে কোনো এক অদ্ভুত কারণে ওর মাথায় এসব বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে।

তন্ময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে পেছন ফিরে ওপরে উঠে আসার; কিন্তু পারছে না। কোনো কিছু একটা ওকে টেনে হির হির করে নামাচ্ছে। ও নিজেকে ছেড়ে দিলো। থাক, যা খুশি হোক। কোথায় যাচ্ছে দেখা যাক। প্রচণ্ড আতঙ্কের সময় গা ছাড়া দিতে হয়, তা হলে আতঙ্ক কিছুটা কাটে।

নামতে নামতে হঠাৎ ও থেমে গেল একটা সিঁড়িতে। ঠিক নিজ থেকে থেমেছে এটা বলা যায় না; ওকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। হঠাৎ করে

ওর রুমের খাটের পাশে রাখা সাইড টেবিলে বসা তনু চোখের সামনে ভেসে এলো। নিজের শরীরটা হঠাৎ হালকা তুলার মতো মনে হলো ওর। ও তনুর শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। কোনোকিছুতে ওর হাত নেই। আর কী আশ্চর্য! বিছানাতে তন্ময় নিজেকে দেখল ঘুমিয়ে থাকতে। চোখের সামনে নিজেকে শুয়ে থাকতে দেখে আতঙ্ক আরও তীব্রতর হলো!

ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে, গোছাতে হবে। তিতিরকে স্কুলে দিয়ে এসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এতগুলো কাজ করতে হয়। প্রচণ্ড আলস্য চেপে ধরেছে তনুকে। ঠিক তনুকে না, তনুর ভেতরে ঢুকে যাওয়া তন্ময়কে।

- এই তন্ময় ওঠো। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে থাকা তন্ময় বাথরুম গেল। বাথরুম থেকে চিৎকার করে বলছে, 'এই তনু আমার টাওয়াল দিয়ে যাও।'

তনু বিছানার ঝাড়ু দিয়ে বিছানা পরিষ্কার করে মাত্র রান্নাঘরে গেছে। বুয়াকে দিয়ে দুপুরের রান্নার কাটাবাছা করাচ্ছে, নিজে সকালের নাস্তা বানাচ্ছিল। শাশুড়ি আম্মা নাস্তা খাবে। তন্ময় অফিস যাবার আগে তাকে টেবিলে নাস্তা দিতে হবে। বুয়াকে দিয়ে কাপড় ধোয়াতে হবে এর পর। দাঁড়িয়ে না থাকলে কাপড় ঠিকমতো ধোবে না। এক কাপড়ের রঙ আরেকটাতে লাগিয়ে একাকার করবে। তার মধ্যে আবার তন্ময়ের সাদা শার্ট আছে আজ। ঘর ঠিকমতো মুছবে না; দাঁড়িয়ে না থাকলে। পরে ওর শাশুড়ি কথা শোনাবে। কথা শুনতে তনুর ভালো লাগে না।

রান্না শেষ করে ফেলতে হবে, তিতিরকে আনতে যাবার আগে। ওর সাড়ে বারোটায় ছুটি। এসব চিন্তা করতে করতে কেমন যেন তন্ময়ের দম আটকে আসছে।

- এই আমি যাচ্ছি। আসতে দেরি হবে।

অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল তন্ময়। অবাক হয়ে নিজেই নিজের যাওয়া দেখল তনুর মাথার ভেতর থেকে। ঝড়ের বেগে তনু সব কাজ করে যাচ্ছে। তন্ময়ের মা আগে খায়, তার খাবার টেবিলে দিয়ে তিতিরকে আনতে যাবার জন্য তনু বের হবে। টেবিল থেকে সায়রা আক্তার বলে উঠলেন, 'কী সব রান্না যে করো, মুখে দেওয়া যায় না।'

তনুর চোখে পানি চলে আসল। ও ভাবছে, বাবার বাসায় থাকতে কখনো মা কিছু করতে দেয়নি। ও তো সব করার চেষ্টা করে, তবু কেন যে কাউকে খুশি করতে পারে না। এই যে সে তন্ময়কে বলেছিল, আজ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, সেটা তন্ময়ের মনেই নেই।

শুধু বলে গেল, আসতে দেরি হবে। তনুর অসম্ভব মন খারাপ লাগছে। ওর সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ লাগছে তন্ময়েরও। আহারে বেচারি। আহারে!

তনুর স্বামীরূপী তন্ময়ের ওপর ওর রাগ লাগছে।

তনু তিতিরকে স্কুল থেকে এনে ওকে খাইয়ে, গোসল করিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে নিজে যখন খেতে গেল, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। এরপর আধঘণ্টার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। সন্ধ্যার নাস্তা বানানোর চিন্তা নিয়ে, ছাদ থেকে কাপড় এনে ভাঁজ করতে হবে, তিতিরকে হোমওয়ার্ক করিয়ে রাতে খাইয়ে আলতো আদরে ঘুম পাড়াতে হবে, রাতে খাবার গরম করে টেবিলে দিতে হবে; এসব চিন্তা নিয়ে, খাবার সময় আবার শাশুড়ি আম্মার কাছে কি না কি শুনতে হয়, সেই আতঙ্ক নিয়ে, সময় করে উঠতে না পেরে আধপড়া বইটার জন্য হাহাকার নিয়ে, রাতে স্বামী ফিরে এলে তার গম্ভীর মুখ দেখবার দুঃখ নিয়ে; যে গম্ভীর মুখের পরতে পরতে আছে এই ভাবনা যে, সে সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত আর তনু বাসায় বেশ আরামেই ছিল।

তনুর মাথার ভেতর তন্ময়ের দম আটকে আসছে। অন্যরকম একটা দুঃখবোধ ছেয়ে ধরেছে ওকে।

ঠিক এই অবস্থায় ও নিজেকে সেই সিঁড়িটাতে দেখতে পেল। তনুর মাথা থেকে বের হতেই ও খুব বড় করে একটা নিশ্বাস নিল। বুকে কীরকম জ্বালা বোধ হচ্ছে।

ও আবার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে, এবার ও ঠিক ওর মায়ের রুমে। ওর মা মাত্র সালাম ফিরিয়েছে নামাজ শেষে। ঠিক একইভাবে ও অসম্ভব আতঙ্ক নিয়ে ওর মা'র মাথায় ঢুকে গেল। মা'র মাথার চিন্তাগুলো পড়তে পারছে স্পষ্টভাবে।

এই মুহূর্তে সায়রা আক্তারের খুব মন খারাপ লাগছে। খাবার শেষে নামাজ পড়েছে মাত্র। তন্ময়টা সকালে কেমন না বলে চলে যায়। উনি ভাবছে, অথচ এই ছেলেটা একদিন মা-ছাড়া কিছু বুঝতই না। বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় যখন স্কুলে যেত বারবার ফিরে ফিরে আসত, এইতো বিয়ের আগ পর্যন্তও 'আম্মা! আমি যাচ্ছি' বলে গলা ছেড়ে চিৎকার, তনু মেয়েটা বেশ ভালোই; তবুও ছেলের এসব কথা মনে পড়লেই, না চাইতেও কেন জানি দুটো কটু কথা বের হয়ে যায় মুখ থেকে; কিন্তু তনুকে যে উনি বেশ ভালোবাসেন– এটা ভালোই টের পান নিজে।

তিতির স্কুল থেকে ফিরেছে। দিদা বলেই বুকে একঝাঁপ দিলো। এই মুহূর্তে নিজেকে বেশ সুখী মনে হচ্ছে তার। বাচ্চাটা এত মায়াবতী হয়েছে।

তিতির ঘুমানোর পরেই তন্ময়ের বাবার কথা মনে হচ্ছে তার। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটালেন, অথচ আগে চলে গেলেন। একলা বেঁচে থাকা এত বুক ভার করা কষ্টের; তা কে জানত। তার চোখের পানি টলটল করছে। ছেলেটাও যদি বুঝত মা'র কষ্টটা। সারাদিনে একটাবার ফোন দিয়ে খোঁজ নেয় না, অথচ আগে ওষুধ খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করত। এখন সব দায়িত্ব তনুকে বুঝিয়ে দিয়েছে। অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর না ডাকলে রুমে খুব একটা আসে না। আগে মুড়িমাখা খেতে কত ভালোবাসত; এখন কোনো রকম জোর করে খায়। অথচ উনি অপেক্ষা করে—কবে ছেলেটা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে। মুড়ি মেখে ছেলেকে ডাকবেন।

তন্ময়ের বুকটা ভেঙে আসছে। আহারে মা! কী কষ্ট! কী কষ্ট!

তন্ময়ের ইচ্ছা করছে চিৎকার করে বলতে, প্লিজ কেউ আমাকে মা'র মাথা থেকে বের করো। প্লিজ!

তন্ময় তখনও সিঁড়িতে দাঁড়ানো। ও আবার বড় করে শ্বাস নিল। আবার চলতে শুরু করছে ও।

তিতিরকে দেখতে পাচ্ছে, ও হোমওয়ার্ক করছে। ওর মা ওকে এইমাত্র বকা দিলো। খাতা দাগিয়ে ময়লা করেছে বলে। তিতিরের মাথায় তন্ময়ের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না আসছে। ওর যে আঁকতে ভালো লাগলে, ও কী করবে।

আজ সন্ধ্যায় তিতির খুব ব্যথা পেয়েছে। মাকে বলেনি। পাপাকেও বলবে না। দুনিয়ার কাউকেই বলবে না ও। বাসায় মজিদ মামা এসেছিল। আসলেই কোলে নেয়। কী পচা করে কোলে নেয়। খুব ব্যথা লাগে।

তন্ময়ের রাগে-ক্ষোভে কেমন লাগছে এই মুহূর্তে ওর ছোট্ট মেয়েটার মাথায় ঢুকে ও নিজেই বলতে পারবে না। মেয়েটা আগেও বলেছিল, মজিদ মামা পচা। উল্টো ওকেই বকেছিল সবাই। বড়দের পচা বলার অপরাধে।

তিতিরের খেতে ইচ্ছা করছে না। মা তবু জোর করে খাওয়াচ্ছে। ইশ, এমন যদি হতো, সারাদিন শুধু চকলেট আর আইস্ক্রিম খেতে হয়। এমন একটা দেশে যদি বাস করত ও। আম্মু খাতা নোংরা করার জন্য বকত না, জোর করে খাওয়াত না, সেটা তো সম্ভব না। কী আর করা। ও খুব আল্লাহর কাছে দুআ করছে—পাপা যাতে তাড়াতাড়ি আসে। পাপার আজ চকলেট আনবার কথা। দিদা বলেছে, মন থেকে আল্লাহকে কিছু বললে উনি সেটা শোনেন। বাবা দেরি করলেই মা ওকে ঘুমপাড়াতে নিয়ে যাবে। ওর বাবার

সঙ্গে দেখাও হবে না, চকলেটও খাওয়া হবে না। সকালে তো বাবা উঠবার আগেই ও স্কুলে চলে যাবে।

তিতির মন খারাপ করে ঘুমোতে গেছে। ওর বাবা এখনো আসেনি।

তন্ময়ের কান্না পাচ্ছে। আহারে বাচ্চাটা আমার। আমার ছোট্ট পরি বাচ্চাটা। আহারে! কেউ ওকে তিতিরের মাথা থেকে বের করে না কেন!

- স্যার! স্যার! উঠুন। আপনাকে এমডি স্যার খুঁজছেন।

তন্ময় ধড়ফড় করে টেবিল থেকে মাথা উঠাল। ওর চোখ টকটকে লাল।

ও বিড়বিড় করে বলছে, 'স্যার হওয়া খুব সহজ; বাবা হওয়া, স্বামী হওয়া আর সন্তান হওয়া বড় কঠিন বুঝলে করিম!'

কী বলেন স্যার?

-নাহ, কিছু না।

হৃদয়জুড়ে স্রষ্টার প্রেম

একদৃষ্টিতে শরিফের দিকে তাকিয়ে আছে আলভি। কত নিবিড় এক স্থিরতা পুরো শরীরে জড়িয়ে ছেলেটা একমনে সালাত আদায় করছে। দুটো সিজদার মাঝখানে বেশকিছু সময় পার করে আরেকটা সিজদা দিলো সে। শরিফকে এমন নিশ্চিন্ত মনে শান্তভঙ্গিতে সালাত আদায় করতে দেখে আলভি ছটফট করতে লাগল; এত অভাব, অশান্তি আর ঝামেলাপূর্ণ জীবনে সালাত আদায় করার ধৈর্য হয় কীভাবে ছেলেটার? অথচ শরিফের তুলনায় আলভির জীবনটা কত বিলাসিতাপূর্ণ। অভাবের স্বাদ কেমন— আলভি সেটা টিভিতে সিরিয়ার মানুষগুলোর ডকুমেন্টারি দেখে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারে; কিন্তু বাস্তবে তার মনে এসব কখনো দাগ কাটেনি। বাপ্পি গতকালই তাকে একটা স্পোর্টস বাইক উপহার দিয়েছে। অবশ্য তার জন্য আলভিকে এটা সিক্রেট রাখতে হবে। তিহজি খালামনির সাথে ভস্তরায় সেডেন হেভেন্স বাড়িটাতে বাবার প্রতি সপ্তাহের শেষ ক'টা দিন হলিডে জীবনযাপনের কথা কাউকে বলে দেওয়া যাবে না।

'চল, যাওয়া যাক'—শরিফের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল আলভি। আসরের সালাত পড়তে নাকি খুব অল্প সময় লাগে, অথচ এটা পড়তে গিয়ে ২০ মিনিট লাগিয়ে ফেলেছে ছেলেটা।

'বড় মামার কাছে একবার যাব। মামা নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।' শরিফের চোখেমুখে আবারো অস্থিরতাগুলো ফুটে উঠেছে। গত তিন দিন ধরে ছোট বোন সালমা নিখোঁজ। বাড়িতে পঙ্গু বাবা চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকছে। 'ইয়া মাবুদ, কোনোদিন তোমার নাফরমানি করি নাই। আমারে তুমি অভাব দিছো, পঙ্গু বানাইছো, কিন্তু তোমারে ভুলি নাই গো, মাবুদ! এইবার আমার অভাগী মা-

মরা মেয়েটারে কেন বিপদে ফেললা? কোন দোষে তুমি আমারে শাস্তি দিতাছ মাবুদ! আমার সালমারে তুমি ঘরে ফিরাইয়া আনো। আমারে আর পরীক্ষায় ফালাইও না মাবুদ!'

'আরে কোথায় আবার যাবে। দেখ্, কারও সঙ্গে পালিয়ে গেছে হয়তো; সাত দিন যেতে দে, দেখবি এমনি এমনি চলে এসেছে। শরিফ, তুই কি বলতে পারবি? তার কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক-টম্পর্ক ছিল কিনা? তা হলে খোঁজ লাগাতে পারি। একটা প্যাঁদানি দিলেই সব ভেলকি বের হয়ে আসবে।'

মামার কথায় হকচকিয়ে গেল শরিফ। এই দুঃসময় এমন একটা কথা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে।

'না মামা, এসব কী বলছেন? সালমার কারও সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কেন? সে ওইরকম মেয়েই না। কখনো বোরকাপরা ছাড়া বাসা থেকে বেরই হয়নি। বরং রোজই আমি তাকে কলেজে আনা-নেওয়া করি। সে কারও সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে করবে? কলেজ থেকে বাসা, বাসা থেকে কলেজ—এই তো তার বাইরে যাওয়া। অন্য কোথাও তো যাওয়ার জায়গা নেই তার।

- মামা, আপনি একটু ভালোমতো যদি খোঁজ লাগান, তা হলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে সালমাকে। বাবা কেমন পাগলের মতো করছে। কিচ্ছু খাচ্ছে না। সালমার খবর না পাওয়া গেলে শোকে বাবা হার্টফেল করবে।'

'আরে পাগল কোনো ক্লু না থাকলে সারা দুনিয়ার কোথায় গিয়ে খুঁজব সালমাকে? আমি সাধারণ কনস্টেবল, গোয়েন্দা তো না। কেউ কিডন্যাপ করলে এতদিনে মুক্তিপণ চেয়ে তোদের কাছে খবর আসার কথা। আরও কটা দিন যেতে দে, দেখবি একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। আর আমিও দেখছি কী করা যায়। সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছিস?'

'আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু আলভি।'

'আ-ল-ভি, বাবার কী করা হয়?'-আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল কনস্টেবল আলি হায়দার।

'মানি এক্সচেঞ্জ-এর ব্যবসা করে।' -বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলো আলভি।

'মানি এক্সচেঞ্জ। বাহ্। নাম কী তোমার বাবার?'

'শেফাক আহমেদ।'

'শে-ফা-ক আ-হ-মে-দ। নামটা চেনা মনে হচ্ছে।

ঠিক আছে কোনো সমস্যা হলে চলে আসবে। টাকা আছে তো দুনিয়ার সবকিছুই হাতের মুঠোয়। বুঝছো না। শরিফ, তুই এখন চলে যা। ডিউটি আছে। কোনো খবর পেলে আমাকে জানাবি। আর আমিও দেখছি কী করা যায়।'

আলভিকে নিয়ে বের হয়ে এল শরিফ। কেন যেন খুব জোরে একটা নিশ্বাস নিতে ইচ্ছা করছে; কিন্তু চারপাশটা যেন বিষাক্ত বাতাসে ভরে গেছে। ঠিকমতো নিশ্বাসটাও নিতে পারছে না সে।

'আলভি, খুব কষ্ট হচ্ছে রে। বোনটা আমার কোথায় আছে কিছুই বের করতে পারছি না। আদৌ বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।'

'চিন্তা করিস না, একটা না একটা উপায় ঠিকই বের হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আর একটু ভালোমতো খোঁজ লাগাতে হবে। তোর মামা বেটা তো পুরাই পাংখা। কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

বলতে বলতেই হেলমেটটা শরিফের দিকে এগিয়ে দিলো সে। দুজনেই উঠে বসল। হঠাৎ পথিমধ্যে মাগরিবের আজান শুরু হলো। শরিফ বলল,

'ভাই, বামের জামে মসজিদটাতে দাঁড় করা। জামাতটা ধরতে হবে, তুই ও পড়বি আয়।'

'মামা, চরম ক্ষুধা লাগছে। তার আগে আয়, খাওয়া-দাওয়া করে আসি। সেই দুপুর থেকে তো তুই ও না খেয়ে আছিস।'

'না রে আলভি। জামাত ছুটে যাবে। আমি সালাত আদায় করে আসছি।'—বলতে বলতেই মসজিদের ভেতরে ঢুকে গেল শরিফ।

আলভি ভীষণ বিরক্ত হলো, সঙ্গে কিছুটা অবাকও হয়েছে সে। এমনি ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে শরিফ; কিন্তু সালাতের সময় আসলেই ছেলেটা মনে হয় পুরো দুনিয়া একপাশে সরিয়ে রেখে সালাত আদায়ের জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়, এদিকে তার বাসায় যাওয়া দরকার; কিন্তু বন্ধুকে এই অবস্থায় রেখে বাসায় রওনা দেওয়া ঠিক হবে না। আলভি আর শরিফ, দুইজন দুই প্রান্তের মানুষ। আলভির অন্যান্য বন্ধুদের অবস্থা আলভিদের মতো না হলেও বেশ সচ্ছল। অন্তত শরিফের মতো এত করুণ অবস্থা নয়। কিন্তু এই ছেলেটাকে আলভির অনেক আপন মনে হয়। কোনো কারণ ছাড়াই এই বন্ধুত্বের মধ্যে অদ্ভুত মায়া আছে। এখনো তাদের পরিচয়ের প্রথম দিনটির কথা মনে আছে তার। ইউনিভার্সিটির প্রথমদিন ক্লাস শেষে যখন ঐশীর সঙ্গে কথা বলছিল, সে তখন খেয়াল করল, একটা ছেলে সেই পেছনের বেঞ্চ থেকে শুরু করে সামনের বেঞ্চ পর্যন্ত আন্ডার ডেস্ক থেকে কী সব যেন খুঁজে খুঁজে হাতে জমা করছে। বিষয়টা বেশ

কৌতূহলী করে দিলো আলভিকে। সে ভাবল, ছেলেটাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক কী হয়। শরিফের অজান্তেই পিছু নিল আলভি। দেখল, হাতে করে নিয়ে আসা কারও পানির বোতল, নোটস, ক্যালকুলেটর, একটা ছোট মেকআপ বক্স—সবকিছু লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড রুমে রেখে আসল শরিফ। ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্য লাগল আলভির। এ কাজটা কেন করল সে? অন্য কেউ হলে তো নিশ্চয়ই ব্যাগে ভরে নিয়ে যেত। এই ছেলেটার ভেতরে অসাধারণ কিছু আছে। এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়। শরিফ লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড রুম থেকে বের হয়ে আসতেই চোখাচোখি হলো তাদের। আলভি দাঁত বের করে হাত বাড়িয়ে দিলো শরিফের দিকে। সেই থেকে দুই বন্ধুর এখন গলায় গলায় ভাব, তবে শরিফের ধর্মকর্ম কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগে আলভির। সে নিজেও মাঝেমধ্যে জুমার সালাত আদায় করে। এমনকি গত দুটো রোজার ঈদের সালাতও আদায় করেছে সে; কিন্তু শরিফের মতো সৎ জীবনযাপন করতে পারে না সে।

ইউনিভার্সিটির প্রথমদিন থেকে এখন পর্যন্ত কোনোদিনও কোনো মেয়ের সঙ্গে শরিফকে কথা বলতে দেখেনি আলভি। শরিফ এত ভালো স্টুডেন্ট যে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য, তার কাছ থেকে নোট নেবার জন্য মেয়েরা সব সময় সুযোগ খোঁজে। একদিন ক্লাসের সবচেয়ে স্মার্ট আর সুন্দরী মেয়ে আনিকা শরিফের সঙ্গে বেশ ভাব জমানোর চেষ্টা করল। বেশ কয়েকদিন ধরেই শরিফকে ইনবক্স করা, ক্যাম্পাসে দেখা হলে তার দিকে ছুটে চলে আসা, প্রেজেন্টেশনের ক্লাসগুলোতে সুন্দর শাড়ি মেকআপ পরে তার নজরে আসার চেষ্টা করেছে সে। শরিফ এর কোনো কিছুই পাত্তা দেয়নি। এতে বেশ অপমানিত হয় আনিকা, যেখানে তার সঙ্গে একটু হাই-হ্যালো করার জন্য ইউনিভার্সিটির সব ছেলে মুখিয়ে থাকে, সেখানে এই সাধারণ ছেলেটা তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। একদিন ক্লাসে সবার সামনে শরিফের বেঞ্চের সামনে গিয়ে আনিকা বলে,

'নিজেকে কী মনে করো তুমি? অনেক বড় বীরপুরুষ হয়ে গেছ? তোমার কাছে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, 'আমার সঙ্গে কথা বলবে কি বলবে না?'

ক্লাসের সবাই অবাক। সবাই হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। পিনপতন নীরবতা।

শরিফ মাথা তুলে বলল, 'দেখো, আমি আল্লাহকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি ভয় করি। আমি ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করি। ইসলামের বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। আমার সঙ্গে আর কখনো কথা বলতে আসবে না।'

সবাই শরিফের কথাগুলো শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। আনিকা যেন কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, এবার কিছু না বলে নিজের সিটে চলে গেল। সেদিনের পর

থেকে শুধু আনিকা নয়, ইউনিভার্সিটির কোনো মেয়েই শরিফের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে না; এমনকি তার চোখে চোখ পড়ে গেলেও মাথা নিচু করে অন্যদিকে চলে যায়।

'খেয়েছিস কিছু?' শরিফের ডাকে চিন্তায় বাধা পড়ে আলভির।

'ও তুই এলি। না রে কিছু খাইনি। চল রেস্টুরেন্টাতে ঢোকা যাক। ক্ষুধায় পেটে ফুটবল খেলছে।'

ছোট এক টুকরো নানরুটি ছিঁড়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে শিক কাবাব মুখে দিলো শরিফ। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'আল্লাহর কাছে ভীষণভাবে চাইলাম রে। নিশ্চয়ই তিনি সালমাকে নিরাপদে রাখবেন এবং সহিসালামতে বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।' বলতে বলতে চোখ চকচক করে উঠল শরিফের।

'তুই এত বিশ্বাসের সঙ্গে কীভাবে বলছিস? তুই আল্লাহকে এত ভালোবাসিস, অথচ তোর জীবনটাকে আল্লাহ কত দুঃখ-কষ্ট দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন।'

'এই ব্যাপারটাই তো ভীষণ ভালো লাগে রে মামা। আল্লাহ তার যে-ই বান্দাকে ভীষণ ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়াতে হাজারো দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। এ সময় আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আরও বাড়িয়ে দিতে হয়। আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে যত বেশি ভালোবাসেন, তাকে তত বেশি পরীক্ষায় ফেলেন।

আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা। আল্লাহ আমাকে এই বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন, যাতে করে পরকালে আমার মর্যাদা ও জান্নাতের নেয়ামত বৃদ্ধি পায়।'

শরিফের এই দীপ্ত কথাগুলো শুনে চোখে পানি এসে যায় আলভির। এত সুন্দর করে ভাবে ছেলেটা। কত ঝড় উঠে তার মাথার ওপর দিয়ে। তার পরেও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তার ভেতর আজ পর্যন্ত কোনো কমতি দেখেনি আলভি। এত আস্থা, এত বিশ্বাস কীভাবে আসে ছেলেটার?

ওদের খাওয়া শেষ হতে হতে বাইরে এশার আজান শোনা যায়। মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে আলভি বলে,

'শরিফ তোর অজু থাকলে একটু অপেক্ষা কর, আমি ওয়াশরুম থেকে আসছি। একসাথে এশার সালাত পড়ে বাসায় ফিরব আজকে।'

এশার আজান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শরিফ মনে মনে বলছে, 'হায় আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাকুলতাগুলো দেখতে পাও। আমার বোনটাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। আমার বোঝা হালকা করে দাও, হে প্রভু!'

আলভি জানে না ঠিক শুদ্ধ নামাজ কাকে বলে। যখন সিজদায় ওর গাল ভিজে এল তখন বিড়বিড় করে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে কীভাবে ডাকতে হয়, তা আমার জানা নেই।

আমার মতো পাপী বান্দার দুআ তুমি কবুল করবে কিনা জানি না। শুধু জানি, শরিফ ছেলেটা তোমাকে খুব ভালোবাসে। ওর মনের কষ্টগুলো তুমি দূর করে দাও। ওর বোনটাকে ফিরিয়ে দাও। আর আমাকে ক্ষমা করে দাও।

সঙ্গে থাকা সবাই সিজদা থেকে উঠে হাত বেঁধে ফেলেছে। আলভি প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে, কান্না থামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে। কেন জানি কান্নাটা থামছেই না।

সালাতের কদর

যদিও আবদুল হামিদ সাহেব পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন বলে তার মেজাজ খুব ফুরফুরে থাকার কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। তার মেজাজ এখন খুবই খারাপ। খুব ভোরে ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে বাসিমুখে এস আলম বাসে উঠতে হয়েছে। বাস ছাড়তে না ছাড়তেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। এর ওপর এমনই কপাল যে, পাশাপাশি দুইটা সিট জোগাড় করতে পারেন নাই। দুই সারির বামদিকে দুটি আর বিপরীত দিকের একটা সিট কিনেছেন। ছোট ছেলেটাকে কোলে রাখতে হবে। আরেকটা সিট নিতে পারলে ভালো হতো; কিন্তু টিকিটের যা দাম, তাতে পোষালো না। কিছুটা কষ্ট হলেও ঠিকঠাক পৌঁছে যেতে পারলে ভালো।

এরমধ্যে বাচ্চাকাচ্চা গুছিয়ে এত হুড়োহুড়ি করে বের হতে হলো, কিছু একটা যে মুখে দেবে সেই সুযোগটাও কেউ পায়নি। তিনি আর তার স্ত্রী হয়তো এখন না খেয়ে থাকতে পারবে, কিন্তু বাচ্চারা? ওরা কীভাবে না খেয়ে থাকবে কে জানে। ওরাও তো কিছু খেয়ে আসে নাই। টিকিট বাসে তো গাড়ি থামিয়ে নামাও যাবে না। সবকিছু কী আর খেয়াল থাকে। স্ত্রীর ওপর এমন রাগ লাগছে, মেয়েদের এতটুকু কমনসেন্স না থাকলে হয় কীভাবে? ছোট বাচ্চা, একটা বিস্কুটের প্যাকেট তো রেবেকা বুদ্ধি করে আনতে পারত।

এখন বাচ্চারা ক্ষুধার কষ্ট পাবে। যাক, আল্লাহ ভরসা দেখা যাক কী হয়। তার কোলে ছোট ছেলে আবদুল্লাহ ঘুমিয়ে আছে। বৃষ্টি হওয়ায় বাস খানাখন্দক পার হওয়ার সময় বেশ ঝাঁকি লাগছে। বাসের সিটগুলোও কিছুটা ছোট। হামিদ সাহেব খুব চেষ্টা করছেন আনন্দের কিছু মনে করার, যাতে করে সাময়িক সমস্যাগুলো ব্রেনে কোনো মেসেজ দিতে না পারে। তেমন কিছুই মনে পড়ছে না। হঠাৎ একটা হাসির ব্যাপার মনে পড়ে

গেল তার। কিছুদিন আগে অফিসে তার অধীনস্ত এক লোককে ছুটি দিতে গিয়ে মজার ঘটনা ঘটেছে।

ডেভিড একটা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে এসেছে। সামনেই তাদের ক্রিসমাস ডে আসছে। সে লম্বা একটা ছুটি চায়। মঙ্গলবারে ক্রিসমাস ডে। ডেভিড বুধ-বৃহস্পতিবারসহ ছুটি চাচ্ছে, যেখানে তার প্রাপ্য ছুটি শুধু মঙ্গলবার। হামিদ সাহেব বললেন, আপনি দুই দিন ছুটি নেন। বৃহস্পতিবারে এসে অফিস করবেন। ডেভিডকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না হামিদ সাহেব। বললেন, 'আপনি আসুন তা হলে।' হঠাৎ হামিদ সাহেবকে অবাক করে দিয়ে ডেভিড বাচ্চা ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল।

'আপনাদের দুইটা ঈদ থাকে স্যার। আপনারা কত ছুটি পান। কিন্তু আমাদের জন্য এই একটামাত্র উৎসব। আমার দিদিমনি আসবে। আমেরিকা থেকে বন্ধুরা আসবে। আমাকে এ দুটো দিনের ছুটিও দিয়ে দিন। আমাদের তো আর উৎসব নেই। আমি রবিবারে এসে সব গুছিয়ে নেব। দয়া করে এই দুটো দিনও ছুটি দেন স্যার।'

হামিদ সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। কিছুটা হাসিও পেল তার। এই পেটমোটা পাতলা চুলের ৩৪ বছরের যুবক সামান্য ছুটির জন্য বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্না শুরু করে দিলো। দরখাস্তের ওপর দ্রুত সই করে ডেভিডকে তার ডেস্কে যেতে বললেন।

এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ছেলেটা ককিয়ে উঠল। হামিদ সাহেব একটু আদর করলেন আবদুল্লাহকে। আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমার ক্ষুধা পেয়েছে বাবা?' আব্দুল্লাহ হয়তো শুনতে পায়নি আবারো ঘুমিয়ে পড়েছে। হামিদ সাহেব পাশ ফিরে দেখলেন, মেয়েটা গভীর আগ্রহে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখছে। সেই যেদিন থেকে বলা হয়েছে গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাবে, সেদিন থেকেই ফাতিমা বলছে, 'আব্বু, আমারে কিন্তু জানালার পাশের সিটে বসতে দিবা।' হামিদ সাহেবের বড় ভালো লাগল। শহরের ব্যস্ততা-ঝঞ্ঝাট ফেলে কিছুটা সময় পরিবার নিয়ে গ্রামে ঘুরে এলে সবার মনটা ভালো থাকবে। কয়েকটা দিন ধরে স্ত্রীর সঙ্গেও বেশ মনোমালিন্য চলছে। আশা করা যায়, গ্রামের মুরুব্বিদের সঙ্গে মিশলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি ছেলের মাথাটাকে মুখের কাছাকাছি এনে হালকাভাবে হেলান দিয়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলেন।

১২:১৬ বাজছে। জোহরের সালাতের সময় শুরু হয়ে গিয়েছে। হামিদ সাহেব জানালা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন ফেরিঘাট আসতে আর কত দেরি। এখনো এক থেকে দেড়ঘণ্টা লাগবে। মসজিদে সালাত আদায় করা সম্ভব নয়। ছেলেটা কোলে আছে। উঠে গিয়ে স্ত্রীর কোলে দিয়ে আসতে গেলেন।

'তুমি ওকে একটু ধরো, আমি নামাজ পড়ব। বাস এখন থামবে না। ওদের নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধা পেয়েছে।'

স্ত্রী বললেন, 'আপনি যখন ফজরের সালাত পড়তে গিয়েছিলেন, তখন তাদেরকে এক প্লেট খিচুড়ি খাইয়ে দিয়েছিলাম।'

হামিদ সাহেব বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ তা হলে তো আর চিন্তা নেই।'

মনে মনে একটু অপরাধ বোধেও ভুগতে লাগলেন, অযথাই রেবেকার ওপর রাগ করছিলেন। ভাগ্যিস উলটপালট কিছু বলেনি।

নিজের সিটে এসে কোলের ওপরে একটা রুমাল বিছিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাজ শুরু করলেন তিনি।

নামাজ শেষে সালাম ফেরাতেই পাশের ভদ্রলোক বলল, 'ভাইসাহেব, এরকম বসে বসে কি আর নামাজ হয়? তারচেয়ে বরং বাড়িতে গিয়ে ভালোমতো দাঁড়িয়ে একবারে সব নামাজ কাজা পড়লেই তো হয়।'

'ভাই নামাজ কাজা করা যায় না।[১] দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে অপারগ হলে বসে, শুয়ে এমনকী ইশারায় হলেও নামাজ আদায় করে নিতে হবে।'

হামিদ সাহেবের কথার উত্তরে লোকটি হয়তো কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু হামিদ সাহেব সুযোগ দিলেন না। উঠে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলেটিকে নিয়ে বললেন, 'এবার তুমি নামাজ পড়ে নাও।'

২:৫০-এ বাস মৌলভীবাজারের কাউন্টারে এসে পৌঁছাল। খালাতো ভাই মকবুল দাঁড়িয়ে আছে স্কুটার নিয়ে।

'আসসালামু ওয়ালাইকুম, বাইসাব, বাবিসাব কিতা খবর; বালানি? বলতে বলতে হামিদ সাহেবের কোল থেকে আবদুল্লাহকে কোলে তুলে নিল মকবুল। ফাতিমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। কতদিন পর ভাতিজা-ভাতিজিদের সাথে দেখা হলো তার। সেই তিন বছর আগে ঢাকায় গিয়েছিল সে, তখন আবদুল্লাহর জন্ম হয়নি। ফাতিমাও খুব ছোট ছিল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবার সাথে গল্পগুজব করছিলেন হামিদ সাহেব, মকবুল ও রোকন ভাই। আগামীকাল সকালে গ্রামের জমিজমাগুলো দেখতে যাবেন তিনি। এ সময়ে আসরের আজান ভেসে এলো কাছের মসজিদ থেকে। হামিদ সাহেব অজু করার জন্য উঠলেন। মকবুল-রোকনকে বললেন, 'তোমরা অজু করি লাও। তোমরার ফুরুত্তারেও কও অজু করি লাইতো।'

---

[১] অর্থাৎ যত সময় উল্লিখিত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা সম্ভব; তত সময় নামাজ কাযা না করাই উত্তম। সেটিই বোঝানো হয়েছে।

অজু করে এসে হামিদ সাহেব মকবুল ও রোকন ভাইকে নিয়ে মসজিদে রওনা হবেন এমন সময় রোকনের ২০ বছর বয়সী ছেলে মোবিন মাঠ থেকে বাড়ি ফিরল। তার সারা পায়ে কাদামাটি।

'আসসালামু ওয়ালাইকুম, চাচা। বালা আসুইন্নি। কুন বেলা আইয়্যার?'

হামিদ সাহেব বললেন, 'ওয়ালাইকুমুস সালাম। বালা আছি বাবা। যাওগি অজু করি লাও। একলগে মসজিদও যাইয়্যার।'

মকবুল বলল, 'চলেন বাইসাব, আমরা জাইগি। তাইন পরে গুসুল কইরা পড়ব।'

মোবিনও মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর বুঝেই আসে না, নামাজ নিয়ে এত আদিখ্যেতার কী আছে!

হামিদ সাহেব মসজিদ থেকে ফিরে আসতে আসতে ওয়াক্তমতো সালাত আদায়ের গুরুত্ব দুই ভাইকে বোঝাতে লাগলেন।

'সালাত মুসলিম জীবনের অপরিহার্য বিষয়, এটি স্বীয় সত্তা ও সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধন বিশেষ। এক ওয়াক্ত সালাত কাজা আদায় করলে জাহান্নামে এক হুকবা শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর এক হুকবা হচ্ছে, ৮০ বছর এবং এক বছর হচ্ছে ৩৬০ দিন, প্রতিটি দিন হচ্ছে হাজার বছরের সমান। [*মাজালিসুল আবরার, আল মানাসিক*] তাই মুসলিমের জীবনে সালাত ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

মকবুল সবই বুঝে শুধু ভাইয়ের সামনে বলতে লজ্জা পায় যে, মোবিন নামাজ আসলে পড়ে না। পড়তে বললে নানান অজুহাত দেখায়।

দেখতে দেখতে সাতটা দিন পার হয়ে গেল। পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেশ ভালো একটা সময় কাটালেন হামিদ সাহেব। ফিরে আসার সময় বাড়ির ভেতরে বেশ কান্নার একটা রোল পড়ল। আবদুল্লাহ-ফাতিমাও ভীষণ কান্না করছে; এই কয়দিনে একদম গ্রামের মানুষ হয়ে গিয়েছিল তারা। খালি পায়ে উঠানে ছোটাছুটি, গরুকে ঘাস খাওয়ানো, চাচিদের কাছে উঠানে মাদুর পেতে গল্প শোনাসহ আরও কত মজা করেছে ওরা। এভাবে ছুটি কাটাতে নিয়ে এলে বাচ্চাদের জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। ওরা নতুন করে ভাবতে শিখে। বিদায় নেওয়ার সময় হামিদ সাহেব পর্দার আড়ালে ভাবিদের সালাম দিলেন। সবাইকে আদর-আপ্যায়নের জন্য শুকরিয়া জানালেন এবং তাদেরকে সালাতের তাগিদ দিলেন। জীবনে যেকোনো পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কখনো সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। কাজ গুছিয়ে সালাত আদায় করবে এমন ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের মৃত্যুর সময় অনিশ্চিত। একটা নিশ্বাস নিয়ে তা প্রক্ষেপন

পর্যন্ত বেঁচে থাকব কিনা তাও আমরা জানি না। তাই দুনিয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার চেয়ে আখিরাতে নিজের কল্যাণের জন্য তৈরি হতে হবে প্রত্যেককে।

বাসে উঠে হামিদ সাহেবের বারবার ব্রোকনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ফেরার সময় হাত দুটো ধরে যখন বলেছিল, 'ভাইসাব, মোবিনের আশা ছাড়ি দিসিলাম। তাইন অউক্কা সাত দিনর মাঝে নিজর তাকি উইট্টা নামাজ পড়া ধরি লাইব, আমি চিন্তাও করতাম পারছি না।'

গভীর রাতে হামিদ চাচার সাথে মোবিনের ঘুরে বেড়ানোর গল্প; মোবিন হয়তো কোনো শীতের রাতে তার পরিবারের অন্য কোনো উঠতি বয়সের ছেলেকে শোনাবে, যে মোবিনের মতোই বুঝতে পারবে না নামাজ পড়াটা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়। একেবারে কম্পলসারি একটা ব্যাপার, এটা বাদ দিলে মুসলিম থাকা যায় না।

মোবিনও সেই অদেখা ছেলেকে মাথায় হাত রেখে আর্দ্র গলায় বলবে, 'বুঝলে ছেলে, নামাজ হলো এডমিট কার্ড, তুমি যতই প্রস্তুতি নাও না কেন, এডমিট কার্ড ছাড়া পরীক্ষাটাই দিতে পারবে না। সবুজ সংঘ গ্রুপে তোমরা টাকা তুলে কেরামত আলিকে চায়ের দোকান করে দিলেও কিয়ামতের দিন এই সব ভালো কাজ বৃথা হয়ে যাবে; হয়তো তখন কেউ একজন তেত্রিশ নাম্বার নিয়ে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে তোমারই চোখের সামনে। সময় গেলে সাধন হয় না বুঝলে?'